ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1564-1569
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.06W.165

লীলা মজুমদারের ‘সব ভুতুরে’: ভুতেদের কথকতা

অন্তরা গোস্বামী, *রাষ্ট্রীয় সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক-২, হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উইমেন, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, অসম, ভারত

Received: 21.07.2025; Accepted: 29.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the world of Bengali literature, one woman writer whose name deserves to be mentioned with respect for her contributions to children's and young adult literature is Lila Majumdar. Through the path of literature, she sowed the seeds of ethics and imagination in the minds of children. With simple, clear language and a vivid imagination, her writing became a delightful medium for young readers. In her book ‘Sob Bhuture’ (All Ghost Stories), she did not instill any negative or frightening thoughts in children's minds. The ghosts she portrayed are not terrifying; though they dwell in the afterlife, they appear in this world with the appearance of their past lives. But as the story progresses, their actions reveal that they are indeed spirits, not humans. She drew her literary material from familiar, everyday social realities. Depending on the subject or context of the stories, she skillfully incorporated the sorrows of life into the narrative. In fact, she tried to present harsh truths of life to children in a light-hearted manner. In all the stories in ‘Sob Bhuture’, the friendship between ghosts and humans becomes a central theme, where each complements the other. In this book, the spirits not only avoid causing harm, but also become companions in times of trouble, developing beautiful friendships with humans.

Keywords: Supernatural, Friendship, Poverty, Social Reality, Morality

শিশু ও কিশোর সাহিত্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে চোরাস্রোতের মত শৈশব স্মৃতির শীতল ধারা যেন বয়ে যায়, যা মনকে প্রশান্তি দান করে। বাংলা সাহিত্যে শিশুসাহিত্য খুবই শক্তিশালী হলেও তার রচয়িতারা দ্বিতীয় শ্রেনীর লেখকরূপেই রয়ে গেছেন। ব্যতিক্রম হিসাবে যদিও বেশ কয়েকজন লেখক বিখ্যাত হয়েছেন। শিশু ও কিশোর সাহিত্য রচনায় শুধু ব্যক্তিনাম নয়, দুটি পরিবারের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। একটি হল রায় পরিবার এবং অপরটি হল ঠাকুর পরিবার। এই রায় পরিবার বংশ পম্পরায় শিশু কিশোর সাহিত্য রচনায় নিবেদিত প্রাণ। পরিবারের সেই পম্পরার পথে অগ্রসর হয়েই মহিলা সাহিত্যিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন লীলা মজুমদার।

ঐতিহ্যবাহী রায়চৌধুরী পরিবারে তার জন্ম ও বড় হয়ে ওঠার কারণে মনোজগতের বিস্তার সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। এই পরিবারেই ১৯০৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা প্রমদারঞ্জন রায় ছিলেন উপেন্দ্রকিশোরের অনুজ ভাই। জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোর ও বড়দাদা সুকুমারের সান্নিধ্যে তার বাল্যজীবন অতিক্রান্ত হয়েছে এবং তারই প্রভাব হিসাবে ‘সন্দেশে’র পাতায় লেখিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ। সুকুমারের মত শৈশব কাল থেকেই লীলা মজুমদারও গল্প বলা ও ছবি আঁকায় ছিলেন সুপটু। তাই দাদার কথাতেই লিখে ফেলেন গল্প

'লক্ষ্মীছাড়া', যা পরে সুকুমার পাল্টে দিয়ে করেন 'লক্ষ্মীছেলে'। এই যে পথচলা শুরু হল তা সারাজীবন ধরে চলতেই থাকল। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল- 'দিন দুপুরে', 'পদীপিসির বর্মীবাক্স', 'আমি নারী', 'বদ্যিনাথের বড়ি', 'হলদে পাখির পালক', 'সব ভুতুড়ে', 'চীনের লণ্ঠন', 'খেরোর খাতা' ইত্যাদি।

সাহিত্যিক পরিবারে জন্মগ্রহণের কারণে তার মনের বিকাশ জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত লক্ষিত হয়। শিশুদের মনে সাহিত্যের পথ বেয়ে তিনি নৈতিকতা ও সাহিত্যের বীজকে রোপণ করে দেন। শিশুদের মনের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাই তো সহজ সরল ভাষার বাঁধনে কল্পনার বিন্যাসে তাঁর লেখনি যেন শিশু ও কিশোর মনের উপাদেয় মাধ্যম হয়ে উঠতে পেরেছে। সমগ্র জীবন তাঁর কাছে মুক্ত পাঠশালা এবং জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি একাগ্র ছাত্রীর ভূমিকা পালন করেছেন। বুদ্ধদেব বসু তার সম্পর্কে বলেছেন তিনি নাকি

> "নতুন যুগের স্বাদ এনেছেন, বিষয়গত বৈচিত্র্য দিয়ে নয়, রূপায়নের অভিনবত্বে। নতুন বিষয়ের নিজস্ব আকর্ষণ আছে।"[১]

তার লেখনি সম্পর্কে তিনি নিজেই লেখেন-

> "সারাজীবনটা চলচ্চিত্রের রিলের মতো মনের সামনে খোলা থাকে। আমার সব ভুলচুক, দৈন্য, অক্ষমতা, অন্যায় শুদ্ধ জীবনকে আমি দেখি।"[২]

সেই কারণেই তাঁর শিল্পের স্বতঃস্ফূর্ততা ও সহজ কথোকথা তাকে শিশু সাহিত্যিকের মর্যাদায় ভূষিত করে।

লীলা মজুমদারের গল্পের জগত জুড়ে রয়েছে পশুপাখি, সংসার, জীবন ও গল্পকথা। আত্মজীবনী 'পাকদণ্ডী' তে তিনি লিখেছিলেন-

> "জ্যাঠামশায়ের চাকর প্রয়াগ আমাদের গল্প বলত। দেশের গল্প, জন্তু জানোয়ারের গল্প।"[৩]

সেই ছোটবেলা থেকেই তার পশুপাখির প্রতি এত সখ্যতা। তাই তিনি তার সাহিত্যে পশুপাখির মুখে জুগিয়েছিলেন ভাষা। পশুপাখিরা শিশুদের খুবই প্রিয়। তাদের মুখের কথা সহজেই শিশুমনকে আকৃষ্ট করে। যেমন- 'ময়না শালিখ', 'বেড়ালের বই' ইত্যাদি। কিন্তু শিশু কিশোরদের মন ভূতের গল্পের প্রতি সুগভীর আকর্ষণ অনুভব করে। আসলে তিনি নিজের জীবন দিয়ে অনুভব করেছেন। 'পাকদণ্ডী' তে তিনি লিখেছিলেন-

> "ছোটবেলায় 'খাসিয়া ঝি' দের কাছ থেকে ভয়ের গল্প শুনতেন।"[৪]

সেই কারণেই ভূতের গল্প তাঁর এত প্রিয় ছিল। তিনি জানতেন-

> "এমন জিনিস লিখতে হবে যা পড়লে ছোটদের মনে সব সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা আসে। তাহলেই লেখার মধ্যে আনন্দ ফুটে উঠবে।"[৫]

এই আনন্দের প্রকাশ 'সব ভুতুড়ে' গল্পগ্রন্থ। এছাড়াও একাধিক পত্র পত্রিকায় নানা রকম ভুতের গল্প তিনি লিখেছেন।

'সব ভুতুড়ে' গ্রন্থটি লীলা মজুমদারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থের একটি। শিশু মনে কোন বিরূপ ধারণা বা নেতিবাচক চিন্তার বিস্তার না ঘটে, তাই তিনি ভুতেদের এমনভাবে অঙ্কিত করেছেন যে, তারা ভয় দেখায় না। তারা পরলোকের বাসিন্দা হলেও ইহজীবনে পূর্বজীবনের চেহারা নিয়েই উপস্থিত। কিন্তু গল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের কার্যকলাপ প্রমাণ করে তারা মানুষ নয় ভূত। তাই লেখিকা 'সব ভুতুড়ে'র ভূমিকা অংশে উল্লেখ করেছেন-

> "শুনেছি মরে গেলে শরীরের এক কণাও নষ্ট হয় না। সবই পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে চিরকাল রক্ষা পায়। তাহলে মানুষের সত্তার শ্রেষ্ঠাংশই বা বিনষ্ট হবে কেন? আরো বলি, মরে গেলে সেই শ্রেষ্ঠাংশের একটা অশুভ পরিণতিই বা হবে কেন?"[৬]

এই চিন্তাধারার সফল প্রকাশ দেখি তার প্রায় প্রতিটি গল্পে।

'ভূত' শব্দের অর্থ অতীত। যা একদা বর্তমান থাকলেও আজ আর তার কোন অস্তিত্ব নেই। এই অজানা বিষয় মনে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করে। প্রায় প্রতিটি গল্পেই এই ভয়াবহতার আবহ তৈরি করা হয়েছে। যেমন- ভেঙে পড়া পাঁচিল, দরজা, জানলা, ঝুল ও ধুলোয় নোংরা ঘর, একশো বা দুশো বছরের পুরনো পরিত্যক্ত বাড়ি ইত্যাদি। অজানা আতঙ্ক বা পরিবেশ জন্ম দেয় রহস্যের যা গল্পের পটভূমি নির্মাণ করে। তবে ভয়াবহ পরিবেশে থেকেও এই অশরীরীরা কিন্তু ভয়ঙ্কর নয়। তারা মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার চেষ্টায় মশগুল। ভুতেরা ফিরে পেতে চায় তাদের

মানব জন্মের গোছান জীবনকে। তাই 'সব ভুতুড়ের' প্রতিটি গল্পে দেখা যায় মানব মনের আলোছায়া। তারাও রোজকার প্রাত্যহিকতার মধ্যে মিশে থাকতে চায়। মানুষ ও ভূতের সম্পর্কের এক অন্যমাত্রা প্রকাশিত হয় এই গল্প গ্রন্থে।

'সব ভুতুড়ের' গ্রন্থের ৪২ টি গল্পকে বিষয় অনুসারে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে-

১. মানুষ ও ভুতের বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

২. ভুতেদের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মানুষের মাধ্যমে পূরণ।

৩. ভুতের ভয় নয়, রূঢ় সমাজবাস্তবতার চিত্রায়ণ।

৪. ভৌতিক ও আতঙ্কের পরিবেশে সাহায্যকারী ভুতের উপস্থিতি।

১. মানুষ ও ভুতের বন্ধুত্বের সম্পর্ক:

'সব ভুতুড়ে' গ্রন্থের মধ্যে বেশ কয়েকটি গল্পে দেখা যায়, ভুত মানুষকে জটিল পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করেছে শুধু নয়, বন্ধুর মত প্রতিনিয়ত তার পাশে দাঁড়িয়েছে। এই গ্রন্থের প্রথম গল্প 'পেনেটিতে' দেখা যায়, কথকের সঙ্গে ভুতেদের বন্ধুত্ব। শিবু, সিজি, গুজি নামক তিন ভুত কথকের সঙ্গে শুধু ভাব জমায় তাই না বন্ধুর মত বড়মামার অনুপস্থিতিতে মাঝিদের গল্প, নৌকাডুবির গল্প, সমুদ্রের কথা বলে ভয় ভাঙাবার চেষ্টা করে। আমাদের পরিচিত বিষয় হল ভুত ভয় দেখায়, কিন্তু লীলা মজুমদারের গল্পে এই ভুত ভয় ভাঙায়। যদিও গল্পের শেষে কথক নিজেই চোখের সামনে দেখে ভুতগুলি-

"ঝুরঝুর করে কর্পূরের মতো উবে গেছে।"[৬]

তখন কথক ও পাঠক ভয় পেয়ে যায়। এখানে ভুত কিন্তু বন্ধুত্ব পালন করে গেছে শেষাবধি।

একই দৃশ্য লক্ষ করা যায় 'আরিহিটোলার বাড়ি' গল্পে। এই গল্পের কথকের বাবার ঠাকুরদাদার ঠাকুরদা শিবেন্দ্র নারায়ণ একটি বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন গঙ্গার ধারে। কথক অঙ্কে কম পেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেয় পৈত্রিক পরিত্যক্ত বাড়িতে। সেই বাড়িতে রাজকীয় খাওয়া দাওয়া, চাকর-খানসামা-ঠাকুরদা-কুট্টি ইত্যাদি লোকেদের সঙ্গে পরিচয়, ঠাকুরদার হস্তক্ষেপে কুট্টির কাছ থেকে অঙ্ক শেখা কথককে অবাক করে দেয়। পরের দিন সকালে কথক জানতে পারে এরা সকলেই ভুত ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু কথক ও পাঠক এই ঘটনায় ভয় পায় না, বরঞ্চ স্নেহশীল দাদুর চিত্রটি এখানে ফুটে ওঠে।

একইরকমভাবে 'অহিদিদির বন্ধুরা' গল্পে ভূত ও অহির মধ্যে গড়ে ওঠে সখ্যতা। সখ্যতা এতটাই গভীর ছিল যে বাড়ি বদলের সময় তারাও অহিকে ছাড়তে চায় না। তারা বলে-

"মোরাও থাকবনি মা, মোরাও চলে যাব।"[৭]

ভুতদের সম্পর্কে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের অবাক করে দেয়।

'ফ্যান্টাস্টিক' গল্পেও রয়েছে ড. ভাগত যখন জীবিত ছিলেন তখন থেকেই মানুষদের সাহায্য করতেন, আশ্রয় দিতেন। একইরকমভাবে আশ্রয় পেয়েছিলেন ছোটমামা, পুঁটি বৌদি এবং দক্ষিণাবাবু। কিন্তু বুড়ো বেয়ারা, চাকর, কুকুর রেড ইত্যাদি চরিত্রগুলি যে অশরীরী তা কাহিনির একেবারে শেষে জানতে পেরে পাঠক পর্যন্ত হতবাক হয়ে যায়। 'পাশের বাড়ি' গল্পতেও কথক মালি অধিকারীর বন্ধুত্বপুর্ণ আপ্যায়ন গল্পকথককে মুগ্ধ করে। কাহিনির পরিসমাপ্তিতে অবশ্যই মালির ভুত হওয়ার ঘটনা পাঠক ও কথককে ভয়ের পরিবর্তে বন্ধুত্বের বাঁধনে আবদ্ধ করে।

'বাপের ভিটে' গল্পে গয়নাদিদি, পেঁচো ও পেঁচোর মায়ের বন্ধুত্ব, 'চেতলায়' গল্পে বটুর ঠাকুমা ও ব্রম্ভদৈত্যির সম্পর্ক, 'পিলখানা' গল্পে ছোট্ট গল্পকথক ও মাহুত হায়দারের স্নিগ্ধ ভালোবাসার সম্পর্ক, 'লাল টিনের ছাদের বাড়ি' ও 'হরু হরকরার একগুঁয়েমি' গল্পে কুসুমকুমারী ও হরু হরকরার আপন ডিউটির প্রতি একাগ্রতা, 'পাঠশালা' গল্পেও ছ্যাঁচোড়ের পাঠশালার জন্য দায়বদ্ধতা, 'গঙ্গায় নমঃ' গল্পে ভুতের সাহায্যে সাহিত্যিক হয়ে ওঠা, 'চোর' গল্পে কালীভক্ত বামুনের শুশ্রূষায় কলঙ্ক থেকে মুক্তি, এবং 'কলম সরদার' গল্পে ভুত কিন্তু গুন্ডা কলম সরদারকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। ফলে এই সকল গল্পেও কিন্তু একই বিষয়ের উপস্থিতি প্রকাশ লাভ করেছে। প্রতিটি গল্পেই ভুত ও মানুষের সুসম্পর্ক ভাষারূপ পেয়েছে।

২. ভুতেদের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মানুষের মাধ্যমে পূরণ:

এই গ্রন্থের একাধিক গল্পে দেখা যায় ভুতেরা যেমন মানুষকে সাহায্য করেছে, তেমনই মানুষও জেনে বা না জেনে ভুতেদের সাহায্য করেছে, তাদের ভালোবেসেছে। আবার এও দেখা গেছে ভুতেদের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণে মানুষ তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় 'অহিদিদির বন্ধুরা' গল্পটি। এখানে প্রায় দুশো বছরের পুরনো সওদাগরের বাড়িতে ভাড়া আসে অহিদিদি। ঐ বাড়ির নৃশংস ইতিহাস তার কাছে ছিল অজ্ঞাত। একবার ভোরে গয়লাদের ছেলেমেয়েরা পৌষ পার্বণের বাসি পিঠে খেতে এসে চিৎকার করেছিল বলে সওদাগর তাদের জিভ কেটে নেয়। এই ইতিহাসের কারণেই অহিদিদির রান্না ঘরে নানারকম উৎপাত শুরু হয়। অহিদিদি আবিষ্কার করে দশজন ক্ষুধার্ত শিশুকে। অহিদিদি তারপর তাদের চার মাস ধরে পেট পুরে পিঠে খাইয়ে তাদের অতৃপ্ত মনের সাধকে পূরণ করে।

'দামুকাকার বিপত্তি' গল্পতিতে দেখা যায়, ভুতেরা বিপদে পরে তাদের মধ্যেকার ঝামেলা মেটানোর জন্য দামুকাকাকে তুলে নিয়ে যায়। ভুত মেয়েদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নির্বাচন করে তার গলায় সোনার মালা পরিয়ে দিতে হবে। এই অংশে হাস্যরসের সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে। ভুত সুন্দরীদের মধ্যে শুরু হয় কামড়া-কামড়ি, হাতাহাতি। দামুকাকা এই সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে ভুতদের আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করেছে।

বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বর্ণনা করতে করতে লেখিকা হাস্যরসের সুন্দর মেলবন্ধন করিয়েছেন। তাই তো 'ভুতুড়ে' গল্পে মেজ পিসেমশাই বৃদ্ধ ভুতকে দু প্যাকেট বিড়ি দিয়েছিল। এমনকি 'সত্যি নয়' গল্পে দেখা যায় মেজমামা জঙ্গলের মধ্যেকার পোড়া জমিদার বাড়িতে জমিদার ও তার ভৃত্যকে খুঁজে দেয় হারিয়ে যাওয়া মাদুলি। গল্পের বিষয়গুলি যেমন মজাদার, ঠিক তেমনি ভূতের ও মানুষের বন্ধুত্বের সীমারেখা কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

শুধু বন্ধুত্বই নয়, ভুতেদের নানারকম সমস্যা সমাধানে মানুষেরাও অগ্রণী ভূমিকা নেয়। 'দামুকাকার বিপত্তি' গল্পে ভুতেরা নিজেরাই বিপদে পড়েছিল।

> "কিঁছু না, শুঁধু এই মেঁয়েগুলোর মঁধ্যে কেঁ যেঁ কাঁর চেঁয়ে ভাঁলো দেঁখতে সেঁটুকু বঁলে দিঁন। আঁমরা তোঁ হিঁমসীম খেঁয়ে গেঁলাম।"[৮]

সত্যি ভুতেদের এই সমস্যা থেকে উদ্ধারের জন্য দামুকাকাই তাদের একমাত্র ভরসা। অবশেষে তাঁর উপস্থিত বুদ্ধিতে ভুতেদের সমস্যার সমাধান হয়। 'স্পাই' গল্পে ফ্রান্সের সমুদ্রের ধারে এক পোড়ো বাড়িতে খাবার নিতে এসেছিল ফিলিপ। ফরাসি বিপ্লবের পরবর্তীকালের দারিদ্রতার শিকার এই ফিলিপ। এই গল্পে ফিলিপ বেঁচে থাকে তীব্র বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায়। এই গল্পটিতে অতিপ্রাকৃত ভাবনা নয়, প্রাধান্য পেয়েছে অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা। মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই যেন ফিলিপের মাধ্যমে রচয়িতা তুলে ধরার চেষ্টা করলেন। 'অশরীরী' গল্পে দেখা যায় ভুতেদের মধ্যে মারামারির চিত্র। এমনকি 'সন্ধ্যা হল', 'ভ-ভুত' ইত্যাদি গল্পেও একই চিত্র দেখা গেছে। আসলে জীবনের দৈনন্দিনতায় এই ভুতেরা যেন মানুষের প্রতীক হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। তারা যেন মানুষের জগতের অংশীদার হতে চায়। তাই তো মানুষের সঙ্গে সখ্যতার এত প্রচেষ্টা। এমনকি মানুষের বিপদের দিনে অর্থনৈতিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এই ভুতেরা, তার প্রমাণ 'শেল্টার' গল্পটি। জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ি অঞ্চলে খ্যাপা ভুত বিশুদা ১৯৪৩ সাল থেকে গোপন আস্তানায় সোনার মোহর আগলে রেখেছিল। তাঁর উদ্দেশ্য কিন্তু মহৎ। সে চায় এই মোহর "দেশের কোন কল্যাণ তহবিলে জমা দেওয়া হোক।"[৯] এই জাতীয় মহৎ চিন্তাভাবনা ভুতেদের অশরীরীর কলঙ্ককে যেন ধুয়ে দেয়।

৩. ভুতের ভয় নয়, রূঢ় সমাজবাস্তবতার চিত্রায়ণ:

লীলা মজুমদার তার সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করেছেন আমাদের চেনা পরিচিত বাস্তব সমাজ জীবন থেকে। এই গ্রন্থের প্রতিটি গল্পগুলি এই বাস্তবতার ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। যদিও শিশু কিশোরদের জন্য তিনি রচনা করেছেন তবুও প্রাপ্ত বয়স্করাও খুঁজে পায় তাদের মনের রসদ। গল্পের বিষয় বা প্রেক্ষাপটের প্রয়োজনে তিনি খুব সুন্দরভাবেই জীবনের ব্যথাতুর দিকগুলোকে কাহিনি বয়নের সঙ্গে যুক্ত করলেন। যেমন- 'আহিরিদিদির বন্ধুরা' গল্পে ২০০ বছর আগেকার এক নৃশংস ঘটনার কথা উঠে এসেছে। ছোট ছোট দশটি ছেলেমেয়েদের করুণ পরিণতি

সাবলীলভাবে জানিয়ে দেন লেখিকা। বাস্তবতার এমন রূপায়ণ সত্যি যেন পাঠক মনকে ভয়ার্ত নয়, বেদনার্ত করে তোলে। অন্যদিকে 'কাঠপুতলি' গল্পেও থুড়থুড়ে বুড়ো জেলে উনো শুনিয়েছে তাঁর করুণ জীবন কাহিনি-

> "বাবার মা ছিল না, সৎমা পেট ভরে খেতে দিত না। বলত, জেলেরা জাল উপুড় করলে দুটো একটা মাছ ছিটকে পড়ে, তাই নিয়ে আসবি। তাহলে খেতে পাবি।"[১০]

পারিবারিক জীবনের অত্যাচার অবিচারের আর একটি চিত্র ধরা পড়ে 'বাপের ভিটে' গল্পে। গয়নাদিদির পরিত্যক্ত বাপের বাড়িতে পেঁচো ও তার মায়ের অশরীরী উপস্থিতি আশপাশের গ্রামের লোকেদের আতঙ্কের কারণ হয়। যদিও এর সঙ্গে যুক্ত আছে মর্মান্তিক জীবনের কাহিনি-

> "বুড়ো কর্তাদাদার সময়ে গয়লা পাড়া থেকে কে তার দুষ্ট বৌয়ের নাক কেটে, ছেলে সুদ্ধ তাড়িয়ে দিয়েছিল।...তা বুড়ো কর্তাদাদু তাদের সারাজীবন তাঁর গোয়াল ঘরে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এমনি তাঁর বুকের পাটা যে কেউ তাদের চুলের ডগাটি ছুঁতে পারেনি। তারাই নাকি এখনও বাড়ি আগলায়, কাউকে আধ ঘণ্টার বেশি টিকতে দেয় না।"[১১]

এই কাহিনিতে শুধু অত্যাচার নয়, কর্তাদাদুর প্রতি পেঁচো ও তার মায়ের কৃতজ্ঞতাবশত বাড়ি সামলানো অবাক করার মত। এই সকল কাহিনিগুলি শুধু ভূতের গল্পেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, জীবনের সামগ্রিকতায় পূর্ণ হয়ে আছে।

শুধু সমাজ ও পরিবার জীবন নয় চরিত্রদের জীবন সংগ্রামও ঠাঁই পেয়েছে লেখিকার লেখনিতে। 'ভয়' গল্পে মাত্র চোদ্দ বছরের বঙ্কুর জীবন সংগ্রাম রচয়িতা খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। মাত্র চোদ্দ বছরের ছেলে বঙ্কু, সারাদিন ছাপাখানায় কাজ করে। তারপর সন্ধ্যেবেলায় নাইট স্কুলে পড়তে যায়। গল্পে আছে-

> "বাবার ডান পা কাটা গেছে, পেনশন যা পায় তাতে ওদের চলে না। তাই বঙ্কু ওদের ওদের হাইস্কুল ছেড়ে এই নাইট স্কুলে পড়তে যেতে হয়।"[১২]

লেখিকা অলীক মনগড়া কোন জগতে নয়, অভাব-অনটন-দুঃখ পীড়িত জীবনের পটভূমিতে তার কাহিনিকে নির্মাণ করেছেন। আসলে শিশুদের মধ্যে হালকাচালে রূঢ় জীবন সত্যকে তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। একই ছবি দেখা যায় 'তেপান্তরের পারের বাড়ি' গল্পে। উদ্বাস্তু ছেলেমেয়েদের অশরীরী সত্ত্বার কাহিনি এটি। সমগ্র গল্পটিতে ভূতের ভয় নয়, খিদের কালোছায়া আচ্ছন্ন করে আছে। গরম ভাতের আকুলতা এভাবেও প্রকাশ করা যায় তা তিনি সার্থকভাবে দেখালেন তার লেখনিতে।

পাশাপাশি তাঁর 'সোহম' নামক গল্পটির মধ্যেও রয়েছে দুঃখ দারিদ্রক্লিষ্ট জীবনের চিত্রায়ন। কিশোরীবাবুর অতীত জীবনের করুণ কাহিনি হঠাৎ করেই তাঁর সামনে উপস্থিত হয়। তিনি দারিদ্র জর্জরিত অতীতকে সামনে দেখে শুধু ভয় পেয়ে যান তা নয়, বরঞ্চ বেদনায় আকুল হয়ে পড়েন। এ প্রসঙ্গে 'তোজো' গল্পটির কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। পাহাড়ি জঙ্গলে অধিবাসীদের কঠোর জীবনসংগ্রাম ও চরম দারিদ্র্যের বিবরণ এই গল্পের মূল বিষয়। দারিদ্রতার মর্মস্পর্শী বিবরণ দিতে গিয়ে লেখিকা লিখেছেন-

> "সেখানকার লোক বড় গরীব, তেল কেনার পয়সা নেই। আলো থাকতে থাকতে, মাঠ ঘাট থেকে ফিরে খাওয়া- দাওয়া সেরে, যে যার শুয়ে পড়ে। মেয়েরা সব দিন রাঁধাবাড়াও করে না, অত চাল কোথায় পাবে? বুনো শাক- কন্দ সেদ্ধ দিয়ে আমড়া পাতা, তেঁতুল পাতা, কাঁচালঙ্কা দিয়ে মেখে খায়। বলে, রান্না ভাত খায় স্বর্গের লোকেরা।"[১৩]

সত্যি এ জাতিয় বর্ণনার মাধ্যমে লীলা মজুমদার যেন অশরীরীর ভয়ের পরিবর্তে সমাজবাস্তবতার নগ্নতাকে ভাষারূপ দিলেন।

৪. ভৌতিক ও আতঙ্কের পরিবেশে সাহায্যকারী ভুতের উপস্থিতি:

অলৌকিক গল্প রচনায় সাহিত্যিকরা বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে সেতু নির্মাণ করেন। ভৌতিক বাতাবরণ পাঠকের মনে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই ভুতেরা ভয় দেখাবে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু 'সব ভুতুড়ে' র প্রায় প্রতিটি গল্পেই দেখা যায় ভুতেরা শুধু মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ তাই নয়, সাহায্যকারী হিসাবেও তাদের অবদান কম নয়। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় 'আহিরিটোলার বাড়ি' গল্পটির কথা। এই গল্পের কথকের বাবার ঠাকুরদাদার ঠাকুরদা শিবেন্দ্র নারায়ণ একটি বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন গঙ্গার ধারে। কথক অঙ্কে কম পেয়ে ঐ

পরিত্যক্ত বাড়িতে আশ্রয় নেয় এবং ঠাকুরদাদার সাহায্যে অঙ্কের সব ভীতি কেটে যায়। শুধু তাই নয়, ঠাকুরদাদার দেওয়া সোনার মোহরটি তাঁর কাছে থেকে যায়। এইভাবে ভুত কিন্তু তাঁর ভবিষ্যতের পথ চলার প্রধান অবলম্বন হয়ে যায়।

'ভুতুড়ে গল্প' তেও মেজো পিসেমশাই ভুতের কাছ থেকে পায় হীরের আংটি, 'দামুকাকার বিপত্তি' গল্পেও দামুকাকা পায় সোনার হারের কিছুটা অংশ। এমনকি 'কর্তাদাদার কেরদানি' গল্পেও ভুত সাহায্যকারী হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। এই গল্পে মেজো কর্তাদাদামশায়ের ভুত গ্রামের মানুষদের দিয়ে গিয়েছিল বহুদিন আগের চুরি যাওয়া বুড়ো শিবঠাকুরের হীরের কণ্ঠি। 'ছায়া' গল্পেও সুন্দরী বাইজীর প্রেতাত্মা গোপেনবাবুকে দিয়ে গিয়েছিল মোহর ভরা হাড়ি। 'চেতলার' গল্পে বটুর প্রপিতামহের ছোট ভাই পুরোন টাকা ভর্তি বাক্স দিয়ে গিয়েছিল বটুকে। 'শেল্টার' গল্পে ক্ষ্যাপা বিশুদার ভুত গুপ্ত কুঠুরিতে মোহরে ঠাসা থলের সন্ধান দিয়ে গিয়েছিল। 'মোটেল' গল্পটি যদিও আগের গল্পের তুলনায় একটু অন্যধারার। এই গল্পে বটুকদা ভুতদের সঙ্গে জুয়া খেলে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মুখ আঁকা রূপোর টাকা পায়। যদিও সেই রাত্রে জুয়া খেলতে গিয়ে ভুতেদের সঙ্গে মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে। কোনরকমে মন্দিরে আশ্রয় নিয়ে তাঁর প্রাণ বাঁচে। তবে তাঁর পরিশ্রমের অর্থ কিন্তু বটুকদা পেয়ে যায়। এই কাহিনিতে ভুত সরাসরি সাহায্য না করলেও পরোক্ষভাবে বটুকদাকে সাহায্য করে যায়। পরোক্ষভাবে সাহায্যের আর একটি গল্পের কথা উল্লেখ করা যায় সেটি হল 'হরু হরকরার একগুঁয়েমি'। কর্তব্যনিষ্ঠ হরু তেরোটি চিঠির কারণে একশো বছরের পর আবির্ভূত হয় উটকোর বড়দাদুর দাদামশায়ের পাঠানো হীরের সীতাহার উটকোর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। হার পেয়ে কাঁপা গলায় উটকোর বড়দাদু বলে ওঠে –

> "এ যে দিদিমার সেই সীতাহার, মা-র কাছে কতবার শুনেছি।"[১৪]

দিদিমার সীতাহার পেয়ে উটকোর বড়দাদু আনন্দে আত্মহারা হয়ে হরুকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য খুঁজতে থাকেন তখন গ্রামের লোক উদ্ধার করেন, বাঁশবনের ভিতরে হরু বা তাঁর ডাকঘরের কোন অস্তিত্বই নেই। এইভাবে বেশ কিছু গল্পতে দেখা যায় অশরীরীরা প্রতিনিয়ত শরীরী বন্ধুদের আর্থিক সাহায্য করে প্রকৃত বন্ধুর দায়িত্ব পালন করেছে।

লীলা মজুমদার তার লেখনির মাধ্যমে পাঠকের কাছে যেন তার নিজের শৈশবকেই তুলে ধরেন। তার লেখনির মধ্যে রয়েছে নিখাদ সারল্য। প্রতিটি গল্পে কোন গুরুগম্ভীর উপদেশ নেই, আছে হালকাভাবে গভীর কথা বলার ক্ষমতা। ছোটদের মন নিষ্পাপ, সরল। তাই তো সহজেই বিশ্বাস করে নেয় ভৌতিক কাণ্ড কারখানা। সেই জন্যই বঙ্কু, পুপে, তোতো আকাশ প্রদীপ জ্বালিয়ে ছিল 'আকাশ পিদিম' গল্পে এবং সেই আলোর পথ বেয়ে নেমে আসে বুড়ি ভুত। লীলা মজুমদারের জগত একটু অন্যরকমের। 'সব ভুতুড়ের' গল্পগুলি লেখিকা মজলিশি ভঙ্গিতে লিখেছেন। গল্পগুলি পড়লেই মনে হয় তার সকল সৃষ্টি যেন নিজের আনন্দময় সত্ত্বার সফল রূপায়ণ। তার লেখনির সরলতা শিশু কিশোর মনকে নিঃশব্দে নৈতিকতার শিক্ষা দিয়ে যায়। তাই আবালবৃদ্ধাবণিতার সাহিত্য পাঠের মনের গঠনে তার অবদান অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র:

১. বসু, বুদ্ধদেব। প্রবন্ধ সংকলন, বাংলা শিশুসাহিত্য। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৯, পৃ: ১৪১।
২. মজুমদার, লীলা। পাকদণ্ডী। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ভূমিকা অংশ।
৩. তদেব, পৃ: ১৯।
৪. তদেব, পৃ: ৬।
৫. মজুমদার, লীলা। সব ভুতুড়ে। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ভূমিকা অংশ।
৬. তদেব, ভূমিকা অংশ।
৭. তদেব, পৃ: ৪।
৮. তদেব, পৃ: ১।
৯. তদেব, পৃ: ৩৮।
১০. তদেব, পৃ:১২৩।
১১. তদেব, পৃ: ২৩।
১২. তদেব, পৃ: ৪৪।
১৩. তদেব, পৃ: ১২৯।
১৪. তদেব, পৃ: ৮৭।